সকল অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ

প্রথম অধ্যায় : মাৎস্য চাষ

- শীতল রক্তবিশিষ্ট জলজ মেরুদণ্ডী প্রাণী হলো– মাছ।
- মাছ মূলত জলজ জীবের প্রায় – ৭০%।
- প্রাণিজ আমিষ গ্রহণে মাছের অবদান – ৬০%।
- বাংলাদেশের মুক্ত জলাশয়ের আয়তন – প্রায় ৪০ লক্ষ হেক্টর।
- অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মধ্যে আয়তন সবচেয়ে বেশি – প্লাবন ভূমির।
- বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বন্ধ জলাশয়ের আয়তন– প্রায় পৌনে ৮ লক্ষ হেক্টর।
- অভ্যন্তরীণ বন্ধ জলাশয়ের মধ্যে আয়তন সবচেয়ে বেশি– পুকুরের।
- সামুদ্রিক জলাশয়ের আয়তন– প্রায় ১,৬৬,০০০ বর্গ কি.মি.।
- নিবিড়তা ভেদে মাছ চাষ পদ্ধতি হলো– ৩ প্রকার।
- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা হয়– এশিয়া মহাদেশে।
- বাংলাদেশের নদ-নদীর অববাহিকায় পাওয়া যায়– প্রায় ৭০ ভাগ মাছ।
- রাজপুঁটি সর্বপ্রথম বাংলাদেশে আমদানি করা হয়– ১৯৭৭ সালে।
- রাজপুঁটি আমদানি করা হয়– থাইল্যান্ড থেকে।
- রাজপুঁটি বিক্রয়যোগ্য হয়– ৬ মাসে।
- রাজপুঁটি চাষের জন্য পুকুরের মাটির উত্তম pH হলো– ৬.০-৮.০।
- রাজপুঁটি চাষের পুকুরের পানির গভীরতা হবে– ১.৫-৩ মিটার।
- রাজপুঁটি মাছের পোনা পাওয়া যায়– বৈশাখ থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত।
- রাজপুঁটি মাছের দৈহিক ওজনের ভিত্তিতে সম্পূরক খাদ্য দিতে হয়– ৪-৬% হারে।
- রাজপুঁটি মাছের হেক্টর প্রতি ফলন– ১.৫-২ টন।
- রাজপুঁটি মাছের ক্ষতরোগ হলো– ব্যাকটেরিয়াঘটিত।
- রাজপুঁটি মাছ ভারসাম্যহীনভাবে চলাফেরা করে– ক্ষতরোগে।
- ক্ষতরোগে আক্রান্ত রাজপুঁটি মাছকে তুঁতের দ্রবণে গোসল করাতে হয়– ১০-১৫ মিনিট।
- মাছ চাষে পুকুরের তলায় নিয়মিত হররা বা জাল টেনে কমাতে হবে– বিষাক্ত গ্যাস।
- রাজপুঁটি মাছের আঁইশ খসা রোগের কারণ– ব্যাকটেরিয়া।
- রাজপুঁটি মাছের ফুলকা পচা রোগ হলো– ছত্রাকজনিত।
- ফুলকা পচা রোগে আক্রান্ত রাজপুঁটি মাছকে গোসল করাতে হয়– ২.৫% লবণ পানিতে।
- রাজপুঁটি মাছের ক্ষতস্থান থেকে আঠালো পদার্থ বের হয়– সাদা দাগ রোগে।
- রাজপুঁটি মাছের উকুন রোগ হলো– পরজীবীঘটিত।
- সর্বপ্রথম বাংলাদেশে নাইলোটিকা মাছ আমদানি করা হয়– থাইল্যান্ড থেকে।
- নাইলোটিকা মাছ বছরে ডিম দেয়– ৩-৪ বার।
- নাইলোটিকা মাছ প্রজননক্ষম হয়– ৩ মাস বয়সে।
- নাইলোটিকার ব্রুড সংগ্রহ করা হয়– মার্চ-অক্টোবরে।
- প্রতি শতকে নাইলোটিকার পোনা মজুদ করা হয়– ৭০-৮০টি।
- নার্সিং হাঁপাতে রেণু পোনা পালন করা হয়– ২১ দিন।
- নাইলোটিকা মাছ চাষের পুকুরের পানির গভীরতা হয়– ১-১.৫ মিটার।
- কীটপতঙ্গ ও আগাছা দূর করতে পুকুরে প্রতি শতকে প্রয়োগ করা হয়– ২০ গ্রাম ডিপটারেক্স।
- পুকুরে প্রতি শতকে চুন প্রয়োগ করা হয়– ১ কেজি।
- পুকুরে প্রতি শতকে নাইলোটিকার পোনা মজুদ করা হয়– ২৫০টি।
- নাইলোটিকা মাছে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা হয়– ওজনের ৫-৬% হারে।
- একর প্রতি নাইলোটিকা মাছের ফলন হয়– ১.২-১.৫ টন।
- উচ্চ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন মাছ হলো– নাইলোটিকা।
- নাইলোটিকা মাছের ক্ষতস্থান থেকে আঠালো পদার্থ বের হয়– সাদা দাগ রোগে।
- নাইলোটিকা মাছের পেটে তরল পদার্থ জমে যায়– উদর বা শোঁথ রোগে।
- নাইলোটিকা মাছের চোখ ফোলা রোগের জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়া হলো– *Streptococcus.*
- বাংলাদেশে মৎস্য চাষির সংখ্যা– ১.৪০ কোটি।
- তেলাপিয়ার চাষ ও বাজারজাতকরণের সাথে জড়িত মৎস্য চাষি, মোট মৎস্য চাষির– ৬০%।
- নাইলোটিকা জাতটি স্থানীয় জাতের চেয়ে বেশি উৎপাদন দেয়– ৫০%।
- অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১২ অনুযায়ী, মোট দেশজ উৎপাদনে মৎস্য খাতের অবদান– ৪.৩৯%।
- আমাদের দেশে রপ্তানি আয়ের মৎস্য উপখাত থেকে আসে– ২.৪৬%।
- মাছ আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় আমিষের যোগান দেয়– প্রায় ৬০%।
- প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৎস্য খাতের ওপর নির্ভরশীল মোট জনসংখ্যার– ১১%।
- মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাসমূহে নিয়োজিত শ্রমিকের মধ্যে নারী হলো– শতকরা ৮০ ভাগ।
- বাংলাদেশে তিন দশকের ব্যবধানে বন্ধ জলাশয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে– সাড়ে তিনগুণ।
- বাংলাদেশে প্রতি বছর রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের চিংড়ি হতে আসে– প্রায় ৬৫%।
- চিংড়ি খাতে উপার্জিত রপ্তানি আয় মোট রপ্তানি আয়ের প্রায়– ৬.১৯%।
- বর্তমানে চিংড়ি খামারের আয়তন– ২৭৫২৩২ হেক্টর।
- বাংলাদেশে চিংড়ি চাষির সংখ্যা–৮.৩৩ লক্ষ।
- সামুদ্রিক চিংড়ি প্রজাতির সংখ্যা– ৩৬টি।
- গলদা চিংড়ির প্রধান আবাসস্থল হলো– স্বাদু পানি।
- বাগদা চিংড়ির প্রধান আবাসস্থল হলো– লোনা পানি।
- গলদা চিংড়ি প্রজননে সক্ষম হয়– ৫-৬ মাসে।

Teachingbd.com

- একটি পরিপক্ক গলদা চিংড়ি ডিম দিতে পারে– এক লক্ষ পর্যন্ত।
- গলদা চিংড়ি হলো– সর্বভুক প্রাণী।
- গলদা চিংড়ির পোনা পাওয়া যায়– মার্চ হতে আগস্ট মাস পর্যন্ত।
- গলদা চিংড়ির পুকুরের গভীরতা হবে– ১-১.৫ মিটার।
- গলদা চিংড়ি চাষের জমির মাটি হবে– ঈষৎ ক্ষারীয়।
- পুকুরে প্রতি শতকে গলদা চিংড়ির পোনা মজুদ করা যায়– ৬০টি।
- পুকুরে মজুদকৃত চিংড়ির খাদ্য দিতে হবে এর মোট ওজনের– ৩-৫% হারে।
- ধানক্ষেতে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে মুখ্য ফসল হলো– ধান।
- বাংলাদেশে ফসল চাষের মধ্যে ধানের চাষ হয়– ৭৭% জমিতে।
- ধানের জমিতে চিংড়ি চাষের জন্য ধান রোপণ করতে হবে– পৌষ-মাঘ বা ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে।
- প্রতি হেক্টরে ধানক্ষেতে গলদা চিংড়ির উৎপাদন হয়– ১০০-১৫০ কেজি।
- ধানক্ষেতে গলদা চিংড়ির পোনা ছাড়তে হয় ধান রোপণের– ১০-১৫ দিন পর।
- ধানক্ষেতে চিংড়ি চাষের ফলে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়– ১০%।
- ঘেরে গলদা চিংড়ি চাষে মাটির pH হবে– ৬.০ এর উপর।
- প্রতি হেক্টর আয়তনের ঘেরে গলদার পোনা অবমুক্ত করা হয়– ১৫,০০০–৩০,০০০ টি।
- গলদা চিংড়ির পা খসা রোগ হলো– ব্যাকটেরিয়াঘটিত।
- লবণ জমিতে হেক্টর প্রতি বাগদার ফলন হয়– ৪০০-৫০০ কেজি।
- পানি থেকে মাছ আহরণের পর পচনক্রিয়া শুরু হয়– ৪-৫ ঘণ্টার মধ্যে।
- বাংলাদেশে সংরক্ষণের অভাবে প্রতি বছর মাছ পচে– ২০-২৫%।
- মাছের শরীরে পানি থাকে শতকরা– ৭০-৮০ ভাগ।
- লবণজাতকরণে লবণ ও মাছের অনুপাত থাকে– ১ ঃ ৪।
- পরিবহনের সময় মাছ ও বরফের অনুপাত থাকে– ১ ঃ ১।
- ধূমায়িতকরণ পদ্ধতিতে মাছ সংরক্ষণ করা যায়– ২-৩ সপ্তাহ।
- বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে মাছ উৎপাদনকৃত স্থান থেকে অন্য স্থানে নেওয়াকে বলে– পরিবহন।
- মাছ পরিবহনের সময় প্রতি ঘণ্টার জন্য লিটার প্রতি বরফ মেশাতে হবে– ১০ গ্রাম।
- মাছের পোনার ব্যাগ অক্সিজেন দ্বারা পূর্ণ করতে হবে– ২/৩ অংশ।
- মাছ উৎপাদকের কাছ থেকে ক্রেতার নিকট পৌছানোই হলো– বাজারজাতকরণ।
- উপকূলীয় অঞ্চলের চিংড়ি শুকানোর ঘরকে বলা হয়– রং ঘর।
- চিংড়ি শুকানোর জন্য সিদ্ধ করা হয়– লবণ মিশ্রিত দ্রবণে।
- প্রতিকূল আবহাওয়ায় চিংড়ি শুকানো হয়– ধোঁয়ার মাধ্যমে।
- চিংড়ি হিমাগারে সংরক্ষণ করা হয়– মাইনাস ১৮°C তাপমাত্রায়।
- চিংড়ি হিমায়িতকরণের জন্য প্লেট ফ্রিজারের তাপমাত্রা হয়– মাইনাস ৪০° ডিগ্রি সেলসিয়াস।
- চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণে বাছাই করার পর প্রথমবার ধৌত করা হয়– ক্লোরিন পানিতে।
- ২-৩ ঘণ্টার কম সময়ে হিমায়িত করলে নষ্ট হয় চিংড়ির– গুণগতমান।
- শুঁটকিতে শরীর গঠনকারী আমিষ থাকে– ৬০-৬৫ ভাগ।
- মাছ শুকানোর সময় কীটপতঙ্গের সংক্রমণ প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়– মোলার সল্ট।
- ভালো মানের শুঁটকিতে জলীয় অংশ থাকে– ১০-২০%।
- আমাদের দেশে সকল কৃষিপণ্য ও মৎস্যপণ্যে ব্যবহৃত বিষাক্ত দ্রব্য হলো– ফরমালিন।
- ফরমালিনযুক্ত লবণাক্ত শুঁটকি মাছ হয়– শক্ত, সাদাটে ও গন্ধহীন।
- আঁইশ শুষ্ক, ফুলকা কালচে এবং চোখ গোলকের ভেতর ঢুকে যায়– ফরমালিনযুক্ত মাছের।
- পরীক্ষাগারে ফরমালিন শনাক্ত করা হয়– টাইট্রেশন পদ্ধতিতে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : পোল্ট্রি পালন

- Aves শ্রেণির যে কোনো জীবকে বলা হয়— পাখি।
- এক বছরের কম বয়সের বাড়ন্ত বয়সের মোরগকে বলা হয়— ককরেল।
- এক বছরের কম বয়সের স্ত্রী মুরগিকে বলা হয়— পুলেট।
- অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে খাসি করা মোরগকে বলা হয়— কেপন।
- অল্প সময়ে বেশি পরিমাণে ও নরম মাংস লাভের জন্য মাংসল জাতের ৪-৫ সপ্তাহ বয়সের মোরগ-মুরগিকে বলা হয়— ব্রয়লার।
- মুরগির শক্ত ঠোঁটকে বলা হয়— বীক।
- মুরগির লিটার বা বিছানাকে বলে — বেডিং।
- মুরগির নবজাতক বাচ্চা হলো— বেবি চিক।
- ২০১৩-১৪ সালে গৃহপালিত পাখি থেকে উৎপাদিত মাংস— ৪৫ লক্ষ টন।
- ২০১৩-১৪ সালে দেশের সার্বক্ষণিক প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের প্রাণিসম্পদ খাত হতে আসে— ২১%।
- গোবর সারের তুলনায় জৈব সারে নাইট্রোজেনের পরিমাণ— প্রায় ৬ গুণ।
- লেয়ার মুরগি ডিম দেওয়া শুরু করে — ৫ মাস বয়সে।
- ব্রয়লার মুরগি বিক্রয়ের উপযোগী হয় — ৬-৮ সপ্তাহ বয়সে।
- উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে মুরগির জাতগুলোকে ভাগ করা যায়— ৩ ভাগে।
- লেগহর্ন, ফাউমি, মিনর্কা, ইসা ব্রাউন হলো— ডিম উৎপাদনকারী মুরগির জাত।

Teachingbd.com

- ডিম ও মাংস উৎপাদনকারী মুরগির জাত হলো— নিউ হ্যাম্পশায়ার, রোড আইল্যান্ড রেড, অস্ট্রালর্প ইত্যাদি।
- ফাউমি জাতের মুরগির উৎপত্তি হলো— মিশর।
- সুসজ্জিত পালকের জন্য বিখ্যাত মুরগি হলো— কোচিন।
- বুনো হাঁসের গোষ্ঠীর নাম হলো— ম্যালার্ড।
- বাংলাদেশে পালিত হাঁসের মধ্যে দেশি হাঁস হলো— শতকরা ৯৫ ভাগ।
- বর্তমানে বেইজিং হাঁস নামে পরিচিত হলো— পিকিং।
- ইন্ডিয়ান রানারের উৎপত্তি হলো— ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া।
- মিসেস ক্যাম্বেল খাকী ক্যাম্বেল জাতের হাঁস আবিষ্কার করেন— ১৯০১ সালে।
- বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার জন্য উপযোগী হাঁস হলো— জিনডিং হাঁস।
- পৃথিবীতে মোট কবুতর আছে— ৬০০ জাতের।
- গোলা জাতের কবুতরের উৎপত্তিস্থল হলো— ভারতীয় উপমহাদেশ।
- আকাশে ডিগবাজী খাওয়া কবুতরের জাত হলো— টাম্বলার।
- মাটিতে ডিগবাজী খাওয়া কবুতর হলো— লোটন।
- সিরাজী কবুতরের উৎপত্তিস্থল হলো— লাহোর।
- লেজের পালক পাখার মত মেলে দিতে পারে বলে এদেরকে বলা হয়— ফ্যানটেইল।
- যে স্থানে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ন্যূনতম সংখ্যক হাঁস-মুরগির বাসস্থান, খাদ্য সরবরাহ, চিকিৎসা প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করা হয় তাকে বলা হয়— খামার।
- পারিবারিকভাবে ব্যবহারের জন্য ডিম ও মাংস উৎপাদনকারী কিছু সংখ্যক হাঁস-মুরগি পালন করলে তাকে বলা হয়— ভরণ-পোষণিক খামার।
- খামারের ধরন, আয়তন ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে— মূলধনের পরিমাণ।
- কোন খামারের সফলতা নির্ভর করে— পরিকল্পনা, মূলধন ও উপকরণের ব্যবস্থাপনার ওপর।
- খামারের হিসাবকে ভাগ করা হয়— ২ ভাগে।
- একটি লেয়ার মুরগির জন্য জায়গা প্রয়োজন— ১ বর্গফুট।
- মুরগির বাচ্চাকে তাপ দেওয়ার ঘরকে বলা হয়— ব্রুডার হাউজ।
- এক মিটার ব্যাসের ব্রুডারের নিচে বাচ্চা রাখা যাবে— ২০০-২৫০টি।
- মুরগির বাচ্চা ফুটানোর জন্য ডিমের ওজন হতে হবে— ৫০-৬০ গ্রাম।
- ফুটানোর জন্য ডিম শীতকালে সংরক্ষণ করা যাবে না— ৭ থেকে ১০ দিনের বেশি।
- ডিম সংরক্ষণের আদর্শ তাপমাত্রা হলো— ১০° সে.
- মুরগির ডিম ফুটার হার বেশি হয় যদি সংরক্ষণের আপেক্ষিক আর্দ্রতা হয়— ৬৫% থেকে ৭০%।
- মুরগির ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে সময় লাগে— ২১দিন।
- ইনকিউবেটরে ডিম ফুটানোর ক্ষেত্রে তাপমাত্রা রাখতে হবে— ৩৮° থেকে ৩৯°।
- মুরগি পালনের সর্বাপেক্ষা পুরানো পদ্ধতি হলো— মুক্ত পালন পদ্ধতি।
- মুক্ত পালন পদ্ধতিতে সাধারণত পালন করা হয়— দেশি মুরগি।
- ডিপ লিটার পদ্ধতিতে লিটারের পুরুত্ব থাকে— ১৫ সেমি.।
- খাঁচায় পালিত মুরগিতে ঘাটতি হয়— ভিটামিন 'বি' এর।
- চিনাবাদামের খৈলে আমিষের পরিমাণ— ৪৬.৫%।
- শরীরে তাপ উৎপাদন ও শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে— শর্করা।
- দেহের পেশি গঠন, ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে— আমিষ।
- হাঁস-মুরগির খাবারে শর্করা জাতীয় উপাদান থাকতে হবে— ৭০-৮০%।
- হলদে ভুট্টায় বেশি থাকে— ভিটামিন 'এ'।
- মিথিওনাইন ও ট্রিপটোফেন নামক অ্যামাইনো অ্যাসিড বেশি থাকে— তিলের খৈলে।
- যে সমস্ত রোগ মুরগির দেহে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সেগুলোকে বলা হয়— সংক্রামক রোগ।
- মুরগির সবচেয়ে মারাত্মক ভাইরাসজনিত রোগ হলো— রাণীক্ষেত রোগ।
- মুরগির এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্য দায়ী সাবটাইপ হলো— H_5 ও H_7।
- মুরগির ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ হলো— কলেরা।
- মুরগির রক্তমিশ্রিত পাতলা পায়খানা হয়— রক্ত আমাশয় রোগে।
- মুরগির রাতকানা রোগ হয় — ভিটামিন 'এ' এর অভাবে।
- মুরগির পলিনিউরিটাইটিস রোগ হয়— থায়ামিনের অভাবে।
- কোয়েলের খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা হলো—৩:১।
- কোয়েলের ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে সময় লাগে— ১৭ থেকে ১৮ দিন।
- বর্তমানে পৃথিবীতে কোয়েল রয়েছে— ১৮ প্রজাতির।
- পূর্ণবয়স্ক কোয়েলকে প্রতিদিন খাবার দিতে হবে— ২০-২৫ গ্রাম।
- বয়স্ক কোয়েলের খাদ্যে আমিষ আবশ্যক— ২২%।
- মুরগির তুলনায় হাঁস বেশি ডিম পাড়ে— ৪০ থেকে ৪৫টি।
- মুক্ত অবস্থায় সর্বোচ্চ হাঁস পালন করা যায়—২০০০ টি।
- ভাসমান পদ্ধতিতে ১২০০ বর্গমিটার পুকুরের উপর মাচা করে হাঁস পালন করা যাবে— ১২০টি।
- বাড়ন্ত ও পূর্ণবয়স্ক হাঁস একত্রে পালন পদ্ধতিকে বলা হয়— হারডিং পদ্ধতি।
- হারডিং পদ্ধতিতে ডিম উৎপাদনের হার হলো— ৪৫-৪৮%।
- ল্যানটিং পদ্ধতিতে একটি ঝাঁকে হাঁস পালন করা যায়— ১০০-২০০টি।
- ল্যানটিং পদ্ধতিতে ডিম উৎপাদনক্ষমতা হলো— ৯০ শতাংশ।
- হাঁসের ডাক প্লেগ হলো— ভাইরাসজনিত রোগ।
- আফলা— টক্সিকোসিস রোগের জীবাণু হলো— *Aspergillus flavus.*

http://teachingbd.com

- শান্তির প্রতীক হলো— কবুতর।
- একজোড়া কবুতর থেকে বছরে বাচ্চা পাওয়া যায়— ১০-১২ জোড়া।
- কবুতরের ডিম থেকে বাচ্চা ফুটতে সময় লাগে— ১৮দিন।
- কবুতরের বাঁচে— ১২-১৫ বছর।
- কবুতরের বাচ্চার নিজের ঠোঁট দিয়ে কোনো খাদ্য দানা গ্রহণ করতে পারে না— ২৮ দিন পর্যন্ত।
- স্কোয়াবকে পিজিয়ন মিল্ক মিশ্রিত খাদ্য খাওয়াতে হবে— ১৪ দিন পর্যন্ত।
- সবুজ ডায়রিয়া হয়— রাণীক্ষেত রোগে।
- কবুতরের ডিম পাড়া কমে যায় ও ডিমের আকৃতি অস্বাভাবিক হয়— ক্যালসিয়ামের ঘাটতিতে।

তৃতীয় অধ্যায় : পশু পালন

- ২-৩ ঘণ্টায় ১ বিঘা চাষ করা যায়— একজোড়া বলদ দ্বারা।
- খনিজ পদার্থ, হরমোন, আমিষ ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায় পশুর— রক্তে।
- গবাদিপশুর মাংসে আমিষ থাকে— ১৫-২০%।
- অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪ অনুযায়ী জনপ্রতি দৈনিক দুধ ও মাংসের চাহিদা যথাক্রমে— ২৫০ মি.লি. ও ১২০ গ্রাম।
- গায়ের রং লাল, নাসারন্ধ্র গোলাপি, গলকম্বল ছোট, পাতলা চামড়া, লম্বা লেজ দেখা যায়— রেড চিটাগাং জাতের গরুতে।
- জিহ্বা ও লেজের রং কালো এবং ২৪ মাসে প্রজননের উপযুক্ত হয়- জার্সি জাতের গরু।
- ৩০ লিটারের বেশি দুধ দেয়— হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান জাতের গরু।
- বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে ও উপকূলীয় অঞ্চলে দেখা যায়—কাদাপানির বা জলাভূমির মহিষ।
- কাদাপানির বা জলাভূমির মহিষের গায়ের রং হয়— কালচে ধূসর।
- আমাদের দেশে ছাগল পালন করে থাকে প্রায়— ৬০% পরিবার।
- ছাগলের দুধ প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে— যক্ষ্মা ও হাঁপানি রোগে।
- অপ্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রী ছাগলকে বলা হয় যথাক্রমে— বাকলিং ও গোটলিং।
- খোঁজাকৃত প্রজনন শক্তি রহিত পুরুষ ছাগলকে বলা হয়—খাসি।
- বাংলাদেশের নিজস্ব জাতের ছাগল হলো—ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল।
- ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল প্রজননের উপযুক্ত হয়—৭-৮ মাস বয়সে।
- ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের একটি ছাগী বছরে বাচ্চা দেয়—২বার।
- গোয়ালঘরে প্রতিটি গাভির জন্য জায়গা রাখা দরকার— ৫ বর্গমিটার।
- এক সারি বিশিষ্ট বাঁধা গোশালায় প্রতিটি গরুর জন্য জায়গা রাখা হয়- ২মিটার।
- একটি দেশি জাতের গরুকে দৈনিক খড় খাওয়াতে হয়—২-৩ কেজি।
- একটি উন্নত জাতের গরুকে দৈনিক কাঁচা ঘাস প্রদান করতে হয়—১২-১৫ কেজি।
- নেপিয়ার, পারা, জার্মান, গিনি, সিগনাল, পেংগোলা, সরগম, ভুট্টা, বাকশা হলো— গ্রীষ্মকালীন ঘাস।
- কাউপি, মাসকলাই, খেসারি জাতীয় ঘাস পাওয়া যায়— শীতকালে।
- সবুজ ঘাসে ফুল আসার সময় কেটে রোদে শুকিয়ে প্রস্তুত করা হয়—হে।
- ১৫-২০% পানি এবং ৮০-৮৫% শুষ্ক পদার্থ থাকে— হে দ্রব্যে।
- বায়ুনিরোধক স্থানে সংরক্ষিত সবুজ ঘাসকে বলে— সাইলেজ।
- ক্ষুরা রোগ, গোবসন্ত, জলাতঙ্ক ইত্যাদি হলো— ভাইরাসজনিত রোগ।
- নাক, মুখ হতে লালা ঝরে, মুখে-জিহ্বায় ও ক্ষুরায় ফোস্কা পড়ে- ক্ষুরারোগে।
- আমাদের দেশের শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ পশুর জলাতঙ্ক রোগের কারণ— কুকুরের কামড়।
- গবাদিপশুর খিচুনি হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত ও গভীর হয়, মলদ্বার দিয়ে কালো রক্তযুক্ত ফেনা বের হয়— তড়কা রোগের কারণে।
- গাভির দুধজ্বর হয়— ক্যালসিয়ামের অভাবে।
- সাধারণত ১০০ কেজির ১টি মহিষের জন্য শুষ্ক পদার্থ প্রয়োজন— ২-২.৫ কেজি।
- মহিষকে ভুসি এবং চিটাগুড় ল্যাক্সেটিভ খাওয়াতে হয়— প্রসবের ৩ দিন আগে থেকে।
- মৃত পশুর ঘরকে গরম পানিতে মিশ্রিত কস্টিক সোডা দ্বারা ধুলে – তড়কা রোগের জীবাণুর মৃত্যু ঘটে।
- মহিষের জিহ্বা ফুলে উঠে, ক্ষত হয়, ঘা ও পুঁজ হয়, নাড়াচাড়া করতে পারে না— শক্ত জিহ্বা রোগ হলে।
- মানুষ ও অন্যান্য পশুপাখির যক্ষ্মা রোগ হয়— মাইকোব্যাকটেরিয়া দ্বারা।
- গবাদি পশুর চূড়ার ক্ষতরোগ হয়— ফিল্যারিয়া গোলকৃমি দ্বারা।
- গবাদিপশুর দেহের বিভিন্ন জায়গায় পানি জমে ফোলা অবস্থা বা এডিমা সৃষ্টি হয়— আমিষের অভাবে।
- ইউএমএস তৈরিতে খড় ব্যবহৃত হয়— ৮২%।
- একটি সুস্থ ছাগলের প্রতি মিনিটে নাড়ির স্পন্দন— ৭০-৯০ বার।
- পিপিআর রোগের অন্য নাম হলো— ছাগলের প্লেগ।
- ছাগলকে রিন্ডারপেস্ট নামক ভ্যাকসিন দিতে হয়— PPR রোগ হলে।
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে পারিবারিকভাবে পশু পালন করা হয়— ২-৫ টি।
- গাভির শরীরে শর্করাজাতীয় খাদ্যের বিপাকক্রিয়ার সমস্যা সৃষ্টি হয়ে বিষক্রিয়া হয়— এসিটোন বা কিটোন দ্বারা।
- গাভি ঘাড় বাঁকা করে শুয়ে পড়ে এবং ওলান শক্ত হয়ে যায়— দুধজ্বরে।

Teachingbd.com

- দুগ্ধবতী গাভিকে প্রথম ৫ লিটার দুধ উৎপাদন করার জন্য প্রদান করতে হয়— ৩ কেজি দানাদার খাদ্য।
- গাভির দুধ ছানার মতো এবং সাথে রক্তও বের হতে পারে— ওলান প্রদাহ হলে।
- বাছুরকে জন্মের পর শুধু মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে— ১ মাস পর্যন্ত।
- কলোস্ট্রামে বেশি পরিমাণে বিদ্যমান থাকে— প্রোটিন ও ভিটামিন এ।
- বাছুরকে ৫ থেকে ৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত দুধ খাওয়াতে হবে শারীরিক ওজনের— ১০%।
- পশুর মাংসপেশি ফুলে যায়, ফোলা জায়গায় চামড়া খসখসে হয়, ফোলা স্থান কালচে হয়ে যায়— বাদলা রোগ হলে।
- বাছুর চাল ধোয়া পানির মতো সাদা ও পাতলা মল ত্যাগ করে— কাফস্কাওয়ার হলে।
- পানিশূন্যতা দূর করার জন্য বাছুরকে ইনজেকশন দিতে হবে— ৫% ডেক্সট্রোজের।
- অপরিষ্কার ছুরি দ্বারা নাভি কাটার ফলে বাছুর আক্রান্ত হয়— ন্যাভল ইল রোগে।
- জন্মের পর বাছুরের নাভি কেটে জীবাণুমুক্ত করতে হবে— আয়োডিন দ্বারা।
- গাভির দুধে পানির পরিমাণ— ৮৭%।
- দুধাল গাভির দুধ উৎপাদন ও গুণগতমান হ্রাস করে— নাইট্রেটযুক্ত ফরেজ।
- দুগ্ধ ট্যাঙ্কে বর্জ্য দূষণের অনুঘটক হিসেবে উপস্থিত থাকে— *Coliform*
- আদর্শ দুধে ফ্যাটের পরিমাণ— ৩.৫%।
- দুধে চর্বির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়— বিউটাইরোমিটার দ্বারা।
- ল্যাকটোমিটার দ্বারা নির্ণয় করা হয় দুধের— আপেক্ষিক গুরুত্ব।
- ১৫° সে. তাপমাত্রায় দুধের স্বাভাবিক ঘনত্ব হলো— ১.০২৮ থেকে ১.০৩১।
- পানি মেশানো দুধে আপেক্ষিক গুরুত্ব হয়— ১.০২৮ এর নিচে।
- মিথাইল ব্লু পরীক্ষা দ্বারা দুধে নির্ণয় করা যায় — ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ।
- দুধে সাধারণত Lactic Acid থাকে— ০.১০ থেকে ০.২০%।
- দুধে Lactic Acid এর পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য ব্যবহৃত হয়— ইথাইল অ্যালকোহল।
- তাপ দ্বারা দুধ একবার ফুটিয়ে রাখলে ভালো থাকে— ৪ ঘণ্টা।
- রেফ্রিজারেটরে ৪° সে তাপমাত্রায় দুধ সংরক্ষণ করা যায়— ১০-১২ ঘণ্টা পর্যন্ত।
- দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণে সর্বপ্রথম পাস্তুরিকরণ প্রক্রিয়ার ব্যবহার করেন— ড. সথসলেট।
- ১৩৭.৮০° সে. তাপে অতি উচ্চ তাপে পাস্তুরিকরণে সময়ের প্রয়োজন— ২ সেকেন্ড।
- পাস্তুরাইজেশন প্রক্রিয়ায় দুধকে ১৬১° সে. তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয়— ১৫ সেকেন্ড
- দুধে কোনো ধরনের জীবাণুই বেঁচে থাকতে পারে না— স্টেরিলাইজেশন করলে।
- বাংলাদেশে উৎপাদতি দুধের মান সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়—৩০%।

চতুর্থ অধ্যায় : বনায়ন

- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বনভূমিতে গাছ লাগানো, পরিচর্যা ও সংরক্ষণকে বলা হয়— বনায়ন।
- প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় একটি দেশে বনভূমি দরকার— মোট আয়তনের ২৫%।
- আমাদের দেশে বনভূমির পরিমাণ— ১৭%।
- বাংলাদেশে বন বিভাগ নিয়ন্ত্রিত জমির পরিমাণ— প্রায় ১৬ লক্ষ হেক্টর।
- আমলকী, বহেরা ও হরিতকীকে একত্রে বলা হয়— ত্রিফলা।
- আমাদের দেশে উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা— প্রায় ৫০০০টি।
- আমাদের দেশে স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রজাতির সংখ্যা— ১২৫টি।
- বাংলাদেশে বনবিভাগ নিয়ন্ত্রিত পাহাড়ি বনের পরিমাণ— সাড়ে ৬ লক্ষ হেক্টর।
- আমাদের দেশের সমতলভূমির বনের অপর নাম— শালবন।
- পৃথিবীর বৃহত্তম প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন— সুন্দরবন।
- সুন্দরবনের ৩টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য নিয়ে গঠিত বনাঞ্চলকে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করেছে— ইউনেস্কো।
- শীতকালে বৃষ্টিপাত ও তাপের অভাবে গাছের পাতা ঝরে পড়ে— পত্রঝরা বনে।
- আমাদের দেশের পত্রঝরা বনের প্রধান বৃক্ষ— শাল।
- জনগণের কল্যাণে জনগণসৃষ্ট বনকে বলে— সামাজিক বন।
- অফিস-আদালত, শিক্ষা, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনায় ও মাঠের পাশে গাছ লাগিয়ে যে বন তৈরি করা হয় তা হলো— প্রাতিষ্ঠানিক বন।
- লিগিউম উদ্ভিদের শিকড়ে উৎপাদিত হয়— নডিউল।
- কৃষি ডাইরি ২০১৫ অনুসারে বাংলাদেশে গ্রামীণ বনভূমির পরিমাণ— ৭.৭৪ লক্ষ।
- সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ ও বনজ সম্পদের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব— শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগ।
- সামাজিক বনের উপকারভোগীরা লভ্যাংশ হিসেবে পাবে বনের মোট আয়ের— শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ।
- চারা রোপণের উপযুক্ত সময়— বর্ষাকাল।
- বাগানের চারা মারা গেলে অতিরিক্ত চারা রোপণ করে বাগানে চারার ঘনত্ব ঠিক রাখাকে বলা হয়— শূন্যস্থান পূরণ।
- চারার গোড়ায় কচুরিপানা, লতাপাতা বা ঘাস দিয়ে ঢেকে দেওয়াকে বলে— মালচিং।
- বাগানে গাছের পর্যাপ্ত আলো-বাতাস এবং ভালো ফলন প্রাপ্তির জন্য করা দরকার— থিনিং।
- চারা রোপণ করার আগে হালকা রোদে রেখে দেওয়াকে বলে— হার্ডেনিং।

http://teachingbd.com

- খড়কুটা, লতাপাতা ও কচুরিপানা দিয়ে চারার গোড়া ঢেকে দেওয়াকে বলে— জাবড়া দেওয়া।
- নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে কোনো গাছের অপ্রয়োজনীয় গাছপালা কর্তন করা হলো— প্রুনিং।
- কোনো গাছকে একটি শক্ত সুন্দর কাঠামো দেওয়ার জন্য গাছের ডালপালা কর্তন করা হলো— ট্রেনিং।
- ব্যবহারোপযোগী কাঠের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য প্রয়োজন— ট্রেনিং।
- কাঠপ্রদানকারী গাছসমূহের ট্রেনিং পদ্ধতি প্রধানত— উচ্চ কেন্দ্র ট্রেনিং।
- গাছের প্রধান কাণ্ডটিকে কিছুদূর পর্যন্ত বাড়ার পর অগ্রভাগ কেটে দেওয়া হয় — মুক্ত কেন্দ্র ট্রেনিং পদ্ধতিতে।
- দীর্ঘমেয়াদি ফলগাছসমূহের ট্রেনিং পদ্ধতি হলো— নাতি উচ্চ কেন্দ্র ট্রেনিং।
- ঘন করে লাগানো ফলগাছের ছাঁটাই করার পদ্ধতি হলো— শীর্ষ ট্রেনিং পদ্ধতি।
- সমপরিমাণ তুঁত ও চুন দ্বারা অম্ল প্রশমন করে তৈরি করা হয়— বোর্দো পেস্ট।
- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম দেশব্যাপী বৃক্ষমেলা প্রবর্তিত হয়— ১৯৯৪ সালে।
- নতুন কৃষি প্রযুক্তির পাশাপাশি বৃক্ষ প্রজাতির সমাবেশ ঘটে— কৃষি মেলায়।
- মেলার স্থান নির্বাচন, মেলা কমিটি গঠন ও কার্যবণ্টন হলো— মেলার সাংগঠনিক উপাদান।
- স্টলে গাছ ও চারার বিন্যাস, চারা পরিচর্যা ও লেবেলকরণ হলো— মেলার কারিগরি উপাদান।

পঞ্চম অধ্যায় : কৃষি অর্থনীতি ও সমবায়

- 'অর্থনীতি হলো সম্পদের বিজ্ঞান' বলেছেন— এ্যাডাম স্মিথ।
- কৃষকের সুসংগঠিত উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও ভোগের একক— খামার।
- পারিবারিক খামারে কৃষক সাধারণত হাঁস-মুরগি পালন করে — ৫-১৫টি।
- আন্তর্জাতিক পারিবারিক খামার বছর ঘোষণা করা হয়— ২০১৪ সালকে।
- বিশেষভাবে পরিকল্পিত মিশ্র খামারকে বলা হয়— সমন্বিত খামার।
- উৎপাদনের লাভ-লোকসান নির্ধারণে ব্যবহার করা হয়— ব্যয় নীতি।
- উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ ও খরচ দ্বারা পণ্য নির্ধারণ করা হয়— প্রতিস্থাপন নীতি দ্বারা।
- শস্য চাষের যাবতীয় কাজের কর্মসূচি হলো— শস্য পঞ্জিকা।
- অশিক্ষিত কৃষকদের জন্য উপযোগী শস্য পঞ্জিকা— ছবি সংবলিত।
- মাসওয়ারী শস্য পঞ্জিকায় প্রতিমাসে কার্যশিট তৈরি কর হয়— ১টি।
- সবচেয়ে ব্যয়বহুল শস্য পঞ্জিকা হলো— ছবি সংবলিত।
- একই জমিতে বিভিন্ন বছর ভিন্ন ভিন্ন ফসল চাষ করাকে বলা হয়— শস্য পর্যায়।
- সর্বোত্তম শস্য পর্যায়ের ব্যাপ্তিকাল— ৩-৪ বছর।
- শস্যে রোগ ও পোকার আক্রমণ কমাতে অনুসরণ করা হয়— শস্য পর্যায়।
- একটি জমিতে এক বছরে পর্যায়ক্রমে ফসল চাষের পরিকল্পনা হলো— ফসল বিন্যাস।
- কোনো জমিতে বছরে যে কয়টি ফসল চাষ করা হয় তার শতকরা হারকে বলে— ফসল বিন্যাসের নিবিড়তা।
- কোনো ফসলের পরিপক্বতা নিকটবর্তী হলে ফসল কর্তনের এক সপ্তাহ অগে শিম জাতীয় ফসলের বীজ বপন পদ্ধতিকে বলে— রিলে চাষ।
- গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাজের জন্য স্বল্প পরিমাণ প্রদত্ত ঋণকে বলা হয় — ক্ষুদ্র ঋণ।
- "কৃষির জন্য ঋণ অত্যাবশ্যক" বলেছেন— ফ্রেডরিক নিকলসন।
- স্বল্পমেয়াদী ঋণের সময়কাল— ৬-১২ মাস।
- মধ্যমেয়াদী ঋণ পরিশোধ করতে হয়— ১-৫ বছরের মধ্যে।
- কৃষি খামারের গড় বেনেফিট কস্ট অনুপাত— ৪ঃ১
- কৃষক ট্রাক্টর কেনার জন্য গ্রহণ করে— দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ।
- কৃষি ঋণের উৎসকে ভাগ করা যায়— ২ ভাগে।
- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়— ১৯৬১ সালে।
- কৃষক বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে— শতকরা ৫৬ ভাগ।
- মোট কৃষি ঋণের মধ্যে গ্রাম্য মহাজনের কাছ থেকে পাওয়া যায়— শতকরা ১৭.৮৫ ভাগ।
- কৃষি ঋণ প্রাপ্তিতে সর্বাধিক সুদের হারের উৎস হলো— গ্রাম্য মহাজন।
- একই উদ্দেশ্যে জোট হয়ে কোনো কাজ করাকে— সমবায় বলে।
- সমবায়ের সংজ্ঞা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হলো— ICA
- ভারতীয় উপমহাদেশে সমবায়ের আনুষ্ঠানিক যাত্রা— ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে।
- কৃষকদের নিজস্ব পেশাগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন— সমবায়।
- বাংলাদেশের সমবায় আইন প্রণীত হয়— ২০০১ সালে।
- সমবায় আইন সংশোধিত হয়— ২০০২ সালে।
- প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা— ২০ জন।
- সমবায় সমিতি আইন লঙ্ঘন করলে জেল হতে পারে— ৭ বছর।
- সমবায় সমিতির প্রত্যেক সদস্যকে শেয়ার কিনতে হয় কমপক্ষে— ১টি।
- ১০০ বা এর কম সদস্য বিশিষ্ট সমবায় সমিতির সাধারণ সভার কোরাম সদস্য — এক তৃতীয়াংশ।
- সমবায়ের অবসায়নের আদেশ দেন— নিবন্ধক।
- উৎপাদিত কৃষিপণ্য সঠিকভাবে ভোক্তার নিকট পৌঁছে দেয়াকে বলে— কৃষি বাজারজাতকরণ।
- সমবায়ের মূলমন্ত্র হলো— একতাই বল।
- বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে মোট জনগণের— ২২%।
- BCR এর পূর্ণরূপ হলো— Benefit Cost Ratio.

Teachingbd.com